2021

1 DHAKA NORTH

পথিক

ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

BANGLADESH BIOLOGY OLYMPIAD

BANGLADESH BIOLOGY OLYMPIAD

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র:	মারুফ আহমেদ
অঙ্গসজ্জা ও সম্পাদনা:	হাসিবুল ইসলাম
সহ-সম্পাদনা:	রাফাত তামিম বিন ইসলাম ও ফারহানা সুলতানা তমা

ভূমিকা

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর প্রাণ,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।

প্রায় শতবর্ষ আগে লেখা রবি ঠাকুরের এই গানের পংক্তিগুলোর মাঝে লুকিয়ে আছে বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের পথচলার মূল অনুপ্রেরণার কথা। প্রকৃতিজুড়ে বৈচিত্র্যময় প্রাণের মেলা দেখে অপার বিস্ময়বোধ, জগৎয়ের রহস্য উন্মোচনের জন্য তীব্র অনুসন্ধিৎসা – মানুষের স্বভাবজাত এসকল অনুভূতিই আজকের জীববিজ্ঞান নামক সুউচ্চ জ্ঞানবৃক্ষের শিকড়ে যুগ যুগ ধরে পুষ্টিনির্যাস যুগিয়ে এসেছে। একবিংশ শতকের একজন মানুষের পরিপূর্ণ বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য জীববিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান অপরিহার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় জীববিজ্ঞান পাঠের ধরণ এমন যে, জীবজগৎ ও এর কার্যপ্রণালী অন্তর দিয়ে অনুধাবনের ব্যাপারটি সেখানে গৌণ, এর বদলে আমরা দেখি কেবল বইয়ে মুখ গুঁজে তথ্য মুখস্থ করার অসুস্থ প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড বা **বিডিবিও** এই প্রচলিত ধারার বিপরীতে, পদ্ধতিগতভাবে জীববিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে এক সামাজিক আন্দোলন।

বিজ্ঞানের চেতনাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে গত একদশক ধরে বিডিবিও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিডিবিওর সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো, ২০১৬ সাল হতে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের পক্ষ হতে প্রতিযোগী প্রেরণ। ২০১৬ ও '১৭-তে দুটি করে মেরিট পুরস্কার লাভ, ২০১৮-তে একটি ও '১৯-এ তিনটি ব্রোঞ্জ পদক জয় – আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের এমন অভাবনীয় সাফল্য অর্জনে অবদান রাখতে পেরে বিডিবিও আনন্দিত ও গর্বিত। সর্বশেষ গত ২০২০ সালেও, কোভিড-১৯ এর আক্রমণে পর্যুদস্ত সময়েও বিডিবিও আয়োজন করে আইবিও চ্যালেঞ্জ ২০২০ এর বাংলাদেশ অধ্যায়, যেখানে অংশ নিয়ে রাদ ও রাফসান ব্রোঞ্জ পদক ছিনিয়ে আনে। সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল-কলেজ পর্যন্ত জীববিজ্ঞানের আলো পৌঁছে দেয়া কিংবা লকডাউনের সমস্ত প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে অনলাইনে অলিম্পিয়াড আয়োজন করা – সবক্ষেত্রেই বিডিবিও আন্তরিকতা ও অধ্যাবসায়ের সাথে কাজ করে গিয়েছে, আর এর পেছনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে রয়েছে বিডিবিওর নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবক তথা এনজাইমরা।

বিডিবিও ঢাকা উত্তর অঞ্চলের এনজাইমদের উদ্যোগে প্রকাশিত হচ্ছে এই ই-ম্যাগাজিন **পত্রক**। তারা কেবল দক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মীই নয়, সেই সাথে শিল্পচর্চায়ও পারঙ্গম। ছোট কলেবরের আয়োজন হলেও **পত্রক**-এর পাতাগুলো বর্ণিল হয়ে উঠেছে নানান স্বাদের লেখা ও ছবির সাজে। সুফলা ধান হতে শুরু করে রুক্ষ মরুভূমির বাস্তুতন্ত্র, ডিএনএ জিন মস্তিষ্ক হয়ে ভৌত বাস্তবতার স্বরূপ, ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ থেকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী বা কুসংস্কারবিরোধী গল্প – এমন বিচিত্র ও আকর্ষণীয় সব বিষয়ের ওপর লেখনী গ্রন্থিত হয়েছে **পত্রক**-এ। আরো আছে প্রতি পাতাতেই ছড়িয়ে থাকা মনকাড়া ইলাস্ট্রেশন, স্থিরচিত্র, অলিম্পিয়াডের টুকরো টুকরো মুহূর্ত ইত্যাদি। আমি **পত্রক** এর প্রকাশনার সাথে জড়িত সবাইকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাই, আশা করি ম্যাগাজিনটি সকল পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে এবং সবার ভালোবাসায় **পত্রক** অচিরেই হয়ে উঠবে বিডিবিও পরিবারের ভবিষ্যৎ পথচলার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মাইনুল ইসলাম খান
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড

উৎসর্গ

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা সকলের স্মৃতিতে...

সূচিপত্র

মৃত্যুর পরবর্তী মস্তিষ্কের সাড়াদান
যাত্রা
বাংলার ধাননামা
History of the Discovery of DNA: The Blueprint for Life
ভয়ংকর অভিজ্ঞতা
“Is Our Fate indeed in Our Gene?”
মরুভূমিতে পানির উৎস
WHAT I GOT FROM BDBO
কল্পনারূপী বাস্তব
DNA DAY 2021
চিত্রকর
ছবিয়ালের দেয়াল
ফিরে দেখা স্মৃতির পাতা: RBO 2019

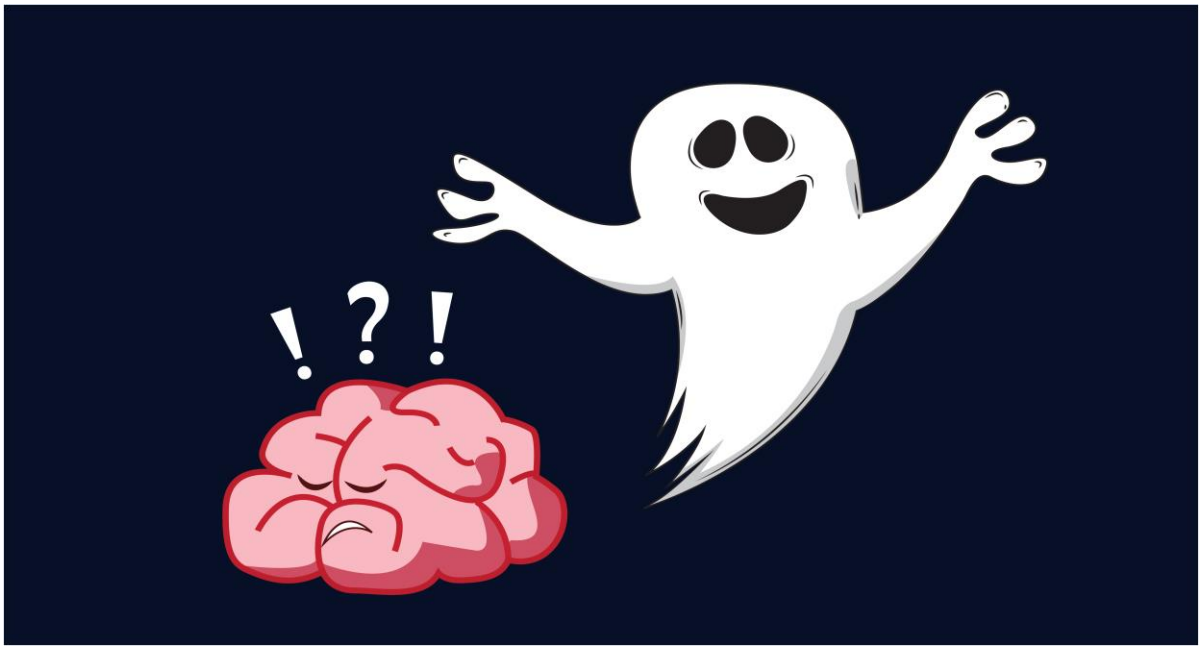

ছবিসূত্র: হাসিবুল ইসলাম

মৃত্যুর পরবর্তী মস্তিষ্কের সাড়া দান...

আমাদের অনেকেরই ধারণা, প্রাণী মরে যাওয়ার পরপরই তার মস্তিষ্ক বা ব্রেইন দ্রুত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কিংবা মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হলেই বোধহয় মানুষ মারা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, মৃত্যুর পরেও মানুষের মস্তিষ্ক বেশ কিছুক্ষণ সচল থাকে! ব্যাপারটা বিস্ময়কর না?

হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলেই আমরা একজন ব্যক্তিকে মৃত বলে ধরে নেই। মূলত শ্বাসতন্ত্র এবং রক্ত পরিবহন বন্ধ হয়ে গেলে দেহ তৎক্ষণাৎ অচল হয়ে যায়। কিন্তু শুনলে বেশ অবাক মনে হয় যে, হৃদপিণ্ড অচল থাকলেও মৃত্যুর পরেও কিছু সময় ধরে মস্তিষ্কে তড়িৎ প্রবাহ চলতে থাকে। আর মস্তিষ্কই দেহের একমাত্র অঙ্গ যা সবার পরে নিষ্ক্রিয় হয়।

আপনারা হয়তো জানেন, মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশটির নাম হচ্ছে 'সেরেব্রাল কর্টেক্স'। এই অংশটি মানুষের চিন্তাভাবনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ করে থাকে। সেরেব্রাল কর্টেক্স অক্সিজেন ছাড়াও ২ থেকে ২০ সেকেন্ড সচল থাকতে পারে। তার মানে মৃত্যুর পরেও মানুষের চেতনা ২ থেকে ২০ সেকেন্ড পর্যন্ত সক্রিয় থাকতে পারে! মৃত্যুর পরে সকল চিন্তা ভাবনা, কাজের নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা কিংবা পেশি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেও এই সময়টাতে মস্তিষ্ক তার শেষ মুহূর্তগুলো অনুভব করতে থাকে। এসময় মস্তিষ্কের কোষগুলো শেষবারের মতো রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। এই রাসায়নিক পদার্থগুলো জীবনের অন্তিম মুহূর্তের দিকে মানুষটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঠিক এই অবস্থায় ডাক্তার যদি লাইফ-সাপোর্ট ব্যবহার করে CPR (Cardiopulmonary Resuscitation)-এর মাধ্যমে রোগীর হার্ট চালু করতে সক্ষম হন, তাহলেই কেবল মস্তিষ্ক আবার কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেন গ্রহণ করা শুরু করবে। কিন্তু যদি তা সম্ভব না হয়, তবে অক্সিজেনের অভাবে মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যেতে শুরু করে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ।

কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তেও মস্তিষ্কের একটি অংশ সহজে নিষ্ক্রিয় হয় না। সেটি হলো মস্তিষ্কের 'স্মৃতিকেন্দ্র'। এসময় জীবনের হাসি-কান্নার সবথেকে সংবেদনশীল স্মৃতিগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠতে শুরু করে। আর সেটিই হয় মস্তিষ্কের সর্বশেষ প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই দেহের সর্বশেষ অঙ্গটিও একসময় নিশ্চুপ হয়ে যায়।

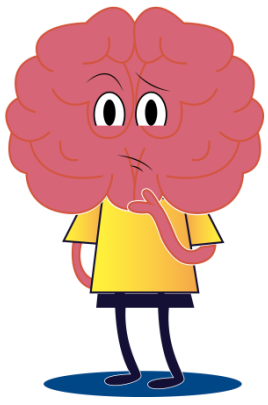

বিজ্ঞানীরা কিছু Clinical Death রোগীর লাইফ সাপোর্ট বন্ধ হবার পর মস্তিষ্কের সিগন্যাল সংগ্রহ করে জানতে পেরেছিলেন যে, মৃত্যুর পরেও একজন মৃত ব্যক্তির মস্তিষ্ক গড়ে প্রায় ১০ মিনিটের মতো সচল থাকে। অর্থাৎ

মৃত্যুপরবর্তী ১০ মিনিট পর্যন্ত তারা অনুভূতিক্ষম ছিলেন। তবে মজার বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞানীদের সংগ্রহ করা Recorded Data মৃত ব্যক্তিদের একেকজনের ক্ষেত্রে একেকরকম ছিলো। তার মানে মৃত্যুর অনুভূতি একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা!

সুমাইয়া আজাদ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অনুষদ।

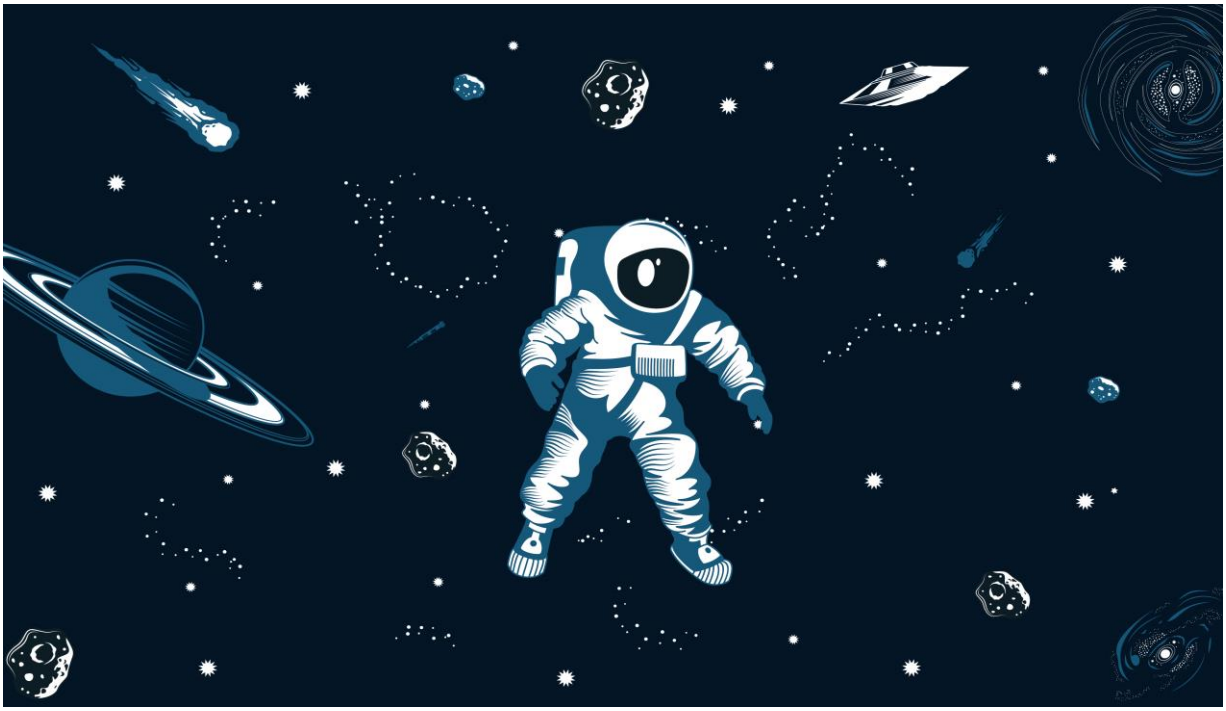

ছবিসূত্র: হাসিবুল ইসলাম

যাত্রা

স্পেরিও এইমাত্র একটি বাটনে চাপ দিয়ে ঠিকমতো পৌছে যাওয়ার খবরটি সিগন্যাল আকারে পাঠিয়ে দিলো। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই অজানা প্রান্তে বসে ওর যেমন একা লাগছে, তেমনি রোমাঞ্চ অনুভূত হচ্ছে। কারণ ইতিহাস আজকের দিনকে সোনালি অক্ষরে মনে রাখবে, সেই সাথে মনে রাখবে ওর নাম। ভাবতেই অবাক লাগছে যে ও এই অসাধ্য সাধনের সাক্ষী হয়েছে। জীবনের এই পর্যায়ে এসে ভাবছে কি করে মানুষ এমন কিছুর ব্যাপারে একসময় কল্পনা করেছিলো!

সময়! খুবই রহস্যময় একটি জিনিস। ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। কিন্তু সময়কে আমরা যতটা ভালোবাসি ততটা মনে হয় আর কোনো কিছুকেই কেউ কখনো ভালোবাসেনি। এই সময়কে জয় করাটা ছিলো একসময় মানবজাতির কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ। কিন্তু বিগত ৩০ বছর আগে মানুষ সর্বপ্রথম এই সময়কে অতিক্রান্ত করতে শিখে। এই সাফল্য বিশাল হলেও এই আবিষ্কার থেকে কোনো সুবিধা পাওয়া এখনো সম্ভব হয়নি। মানুষ ক্রমান্বয়ে প্রায় ৭ হাজার বছর ভবিষ্যতের বিভিন্ন সিগন্যাল রিসিভ করতে সক্ষম হয়, কিন্তু তার প্রায় সবই ছিলো দুর্বোধ্য। প্রায় ১৫ বছর আগে প্রথমবারের মতো মানুষ সময় ভ্রমণ বা টাইম ট্রাভেলে সক্ষম হয়। কিন্তু তা ছিলো মাত্র কয়েকদিনের ভবিষ্যৎ

ভ্রমণ! আর আজ এই ১৫ বছর পরে স্পেরিও প্রথমবারের মতো ৩ হাজার বছর ভবিষ্যতে চলে এসেছে! বিজ্ঞানের এমন অভাবনীয় উন্নতি কল্পনা করা যায়!

এখানে আসার আগে স্পেরিও এই গ্রহটি নিয়ে বেশ পড়াশোনা করেছিলো। কিন্তু সেই 'বেশ পড়াশোনা' মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার বেশি না। সত্যি বলতে এই গ্রহের অবস্থান, বা এটি কোন গ্যালাক্সিতে অবস্থিত তা কিছুই স্পেস শাটল কর্তৃপক্ষ জানে না। শুধু দরকারী তথ্যের মধ্যে এটুকুই জানে যে এই গ্রহের তাপমাত্রা মানুষের সহ্যসীমার প্রায় শেষপ্রান্তে। এতটা গরম এখানে যে এই তাপমাত্রায় সাধারণ মানুষের হিট স্ট্রোক করতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে।

স্পেরিও তার ট্রেনিংকে কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে গ্রহটিতে অবতরণ করলো। সে জানে এখান থেকে পাওয়া সিগন্যাল বিশ্লেষণ করে যা পাওয়া গেছে, তাতে এখন পর্যন্ত কোনো জীবের অস্তিত্ব থাকার কথা না। যদিও বা থাকে, তাও এককোষী শৈবাল ছাড়া কিছুই না। তাই স্পেরিও এলিয়েনদের সাথে সাক্ষাতের রোমাঞ্চটা দূরে সরিয়ে রাখলো।

গ্রহটিতে এখন রাত। স্পেরিও প্রথমেই নিজের দেশের পতাকা মাটিতে গেঁথে দিয়ে এখানের মাটির কিছু স্যাম্পল নিয়ে নিলো। এরপর ঘুরে বেড়াতে লাগলো। চারদিকে ধু ধু বালি আর শুকনো মাটি। গ্রহটিতে বায়ুমণ্ডল আছে। কিন্তু অক্সিজেন মিটারে যা দেখলো তাতে অক্সিজেনের পরিমাণ এতই সামান্য যে শ্বাস-প্রশ্বাস অসম্ভব। স্পেরিও হাঁটতে হাঁটতে সামনে বেশ উঁচু একটি ঢিবি দেখতে পেলো। এটাকে যদি টিলা বলি তাহলে সবথেকে ছোট টিলা বলতে হয়। স্পেরিও একটু অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলো। তার ইচ্ছা হচ্ছে টিলাটি বেয়ে উঠতে, কিন্তু কে যেন মনের ভেতর থেকে বলছে, "কি দরকার অতটা বেঁয়ে ওঠার!" অবশেষে অদম্য ইচ্ছার কাছে স্পেরিও হার মানলো। তিন হাজার বছরের ভবিষ্যতের কোনো নাম না জানা গ্রহে তো নিত্য আসা যাওয়া করা যাবে না।

সে টিলাটি বেঁয়ে উপরে উঠে গেল। পৃথিবীর সময়ের মাত্র ১০ মিনিটের মতো সময় লাগলো তাতে। ওপরে এসেই স্পেরিওর হৃদপিণ্ড যেন থমকে গেল। এধরনের কিছু এখানে দেখবে তা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। এখানে আস্ত একটি পুকুর আছে! তবে তাতে পানির বদলে আছে সবুজ রঙের কিছু তরল! স্পেরিওর মনে পড়ে গেল এখানে তো এককোষী শৈবাল থাকতে পারে। সেজন্যই হয়তো এখানে পানির রং সবুজ। আর শৈবাল থাকায় বাতাসে সামান্য অক্সিজেনও আছে। হৃদপিণ্ডের হঠাৎ অস্থিরতা অনেকটা শান্ত হয়ে এলো। সে পানির স্যাম্পল নেয়ার জন্য পুকুরটির পাড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

ঠিক এমন সময় তার মনে হলো কেউ একজন কিছু বলে উঠলো। স্পেরিও সতর্ক হয়ে গেল। কিন্তু আশেপাশে কোনো জীবিত কিছুর নামমাত্রও নেই। সে ভাবলো হয়তো নার্ভাস থাকায় তার এমন মনে হচ্ছে। আবার পুকুরের দিকে এগোতে লাগলো। সাথে সাথেই টের পেলো কেউ একজন বলছে,"সাবধান, আমার খাবার ধরবেন না" !

ছবিসূত্র: হাসিবুল ইসলাম

আশ্চর্য! সাউন্ড রিসিভ করার সেন্সরগুলোতে কোনো নড়াচড়া পাচ্ছে না, আশেপাশেও কিছু নেই। তাহলে শব্দ এলো কোথা থেকে! আর এই শব্দের অর্থই বা স্পেরিও বুঝতে পারলো কি করে! এমন সময় আবার কেউ একজন বলে উঠলো, "নিজের দেশে ফিরে যান, এখানে আপনার কাজ নেই।" স্পেরিওর হাত পা জমে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে ভয়ে। কারণ সে নিশ্চিত যে তার

যন্ত্রগুলো তাকে যাই বলুক, সে নিজের কানে কথাগুলো শুনছে। নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করলো বহু কষ্টে। এরপর মিনমিন স্বরে বললো, "কে বলছেন? সামনে এসে কথা বলেন।" কথাটা বলে ওর নিজেকে গাধা মনে হতে লাগলো। কোনো এক অজানা অচেনা ভিনগ্রহের প্রাণিকে এই আধো-অন্ধকারে সামনে আসার জন্য বলছে!

"আমি আপনার সামনেই আছি", আবার কেউ একজন বলে উঠলো। এবার স্পেরিও বিষয়টা ধরতে পারলো। কথাটা কেউ বলছে না, বরং তার মস্তিষ্কে সিগন্যাল পাঠাচ্ছে! এজন্যই কোনো যন্ত্রে কোনো কিছু নির্দেশ করছিলো না। এবার স্পেরিওর ভয়ের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। কি মুশকিল! কোনো এক অজানা সময়ে অজানা গ্রহে অজানা প্রাণির সম্মুখীন হলো যে কিনা কথা বলে না, বরং কথা মস্তিষ্ক বরাবর ছুঁড়ে মারে!

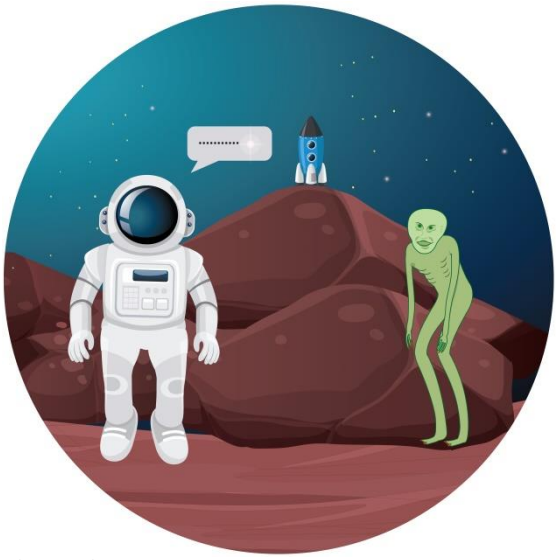

ছবিসূত্র: হাসিবুল ইসলাম

চারদিকে আলো ফেলে স্পেরিও দেখতে লাগলো। এবার সে একটি কুণ্ডলী পাকানো কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখলো যেটা মাটি বা পাথরের মতো না। সে মোটামুটি নিশ্চিৎ যে, যা কিছু হচ্ছে এই বস্তু বা জীবটিই করছে। ভয়ে ভয়ে সে একটু সামনে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আপনিই কি এতক্ষণ কথা বলছিলেন? কে আপনি? এভাবে পড়ে আছেন কেন?"

"আমি এরিনিন, এটাই আমার বাড়ি, আর আমার বাড়িতে আমি যেমন খুশি থাকবো, তাতে আপনার কি? আপনাকে না চলে যেতে বলেছি?"

"দেখুন মিস্টার এরিনিন, আমি আপনার কোনো ক্ষতি করতে আসিনি। একটু ঘোরাফেরা করেই চলে যাবো। আপনাদের মাটি-পানি কেমন তা একটু জানতে চাচ্ছিলাম, এই আরকি", স্পেরিও একটু সাহস সঞ্চার করে বললো।

"হাহ্, আপনি হাসালেন। যারা নিজেদের পুরো গ্রহকেই ধ্বংস করে ফেলে, নিজের বাসস্থানের ক্ষতি করে, তারা নাকি অন্যের বাসস্থানের কোনো ক্ষতি করবে না! এধরনের হঠকারিতা বাদ দিয়ে দ্রুত চলে যান।", এরিনিন জবাব দিলো।

স্পেরিও একটু হক্‌চকিয়ে গেল। কি বলছে লোকটা! আমরা কি করে আমাদের গ্রহ ধ্বংস করেছি! সে বললো, "দেখুন, আমরা নিজেদের গ্রহ ধ্বংস করে আপনার গ্রহ দখল করতে আসিনি। তাছাড়া আপনাদের এই গ্রহে লোকজন কই?" এবার এরিনিন একটু নড়েচড়ে উঠলো। স্পেরিও দেখলো লোকটি দেখতে প্রায় মানুষের মতোই! শুধু শুকনো পাটকাঠির মতো, আর গায়ের রং ফ্যাকাশে সাদা, তাতে সবুজের কিছুটা আঁচ আছে। চেহারার মধ্যে দুটো চোখ আছে কিন্তু তা ভাবলেশহীন। ঠোঁটদুটি খোলা, চোয়াল ঝুলে পড়া, তাতে দেখা যাচ্ছে মুখে কোনো দাঁত নেই, এমনকি জিহ্বাও নেই। আঙ্গুলের প্রান্তে নখের বদলে গাছের বাকলের মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। এরিনিন বৃদ্ধ মানুষদের মতো গুটিশুটি মেরে বসে রইলো। এদিকে এরিনিনের মুখে দাঁত নেই দেখে স্পেরিও কিছুটা আশ্বস্ত হলো। আর যা হোক, ব্যাটা অন্তত কামড়ে খেয়ে ফেলতে পারবে না। এরিনিন বলে উঠলো, "এখানে যারা থাকে তারা সূর্যের আলোর সাথে সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু পরেই সকাল হলে সবাই ফিরে আসবে।"

স্পেরিও কোনো আগা মাথা না বুঝতে পেরে বললো, "একটু বুঝিয়ে বলবেন মিস্টার এরিনিন? অন্যরা যদি আলোর পেছনে ছোটে তাহলে আপনি এখানে কেন?"

এবার এরিনিন কিছুক্ষণ ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে রইলো। বোধহয় ভাবছে একে কিছু বলা উচিত হবে কি না। অবশেষে বললো, "আমাদের খাদ্যই হলো আলো। সবাই খাবারের আশায় ছুটছে। আমি একটু

ভিন্ন। তাই আমি এখানে বসে আছি। আমার খাবার ওইদিকে।" বলে পুকুরটি দেখিয়ে দিলো। স্পেরিও এবার বললো, "আলো কি করে খাবার হতে পারে?" এবার এরিনিন খেঁকিয়ে উঠলো, "কেন হতে পারে না? আপনাদের গাছ কি খায়?" স্পেরিও সাথে সাথে জবাব দিলো, "গাছের তো ক্লোরোফিল আছে। তাই..."

"আমাদেরও ক্লোরোফিল আছে, তাই আমরা আলো খাই। দেখছেন না শরীর সবুজ?" এরিনিন বললো। স্পেরিও জবাব দিলো, "কিন্তু তা কি করে সম্ভব?" এরিনিন বললো, "আপনি নিশ্চয়ই জানেন ক্লোরোপ্লাস্ট একসময় একধরনের ব্যাকটেরিয়া ছিলো। এটি কোনো একসময় আপনাদের উদ্ভিদ কোষের সাথে একসাথে থাকতে শুরু করেছিলো। আপনারা তো একে এন্ডোসিমবায়োটিক থিওরিও নাম দিয়েছেন।"

স্পেরিও বললো, "হ্যা, ঠিক বলেছেন, কিন্তু তা তো উদ্ভিদে।" এরিনিন বললো, "যদি উদ্ভিদ না থাকে তবে প্রাণির সাথে বসবাসে নিষেধ কোথায়? এখানে উদ্ভিদের বিলুপ্তি হয়েছে বহু আগেই।" স্পেরিও কাছে এর কোনো জবাব নেই। সে বললো, "তাহলে আপনি আলাদা কি করে বুঝলাম না।" এরিনিন বললো, "আপনাদের যেমন শরীরে বিভিন্ন উপাদানের ঘাটতি থাকে, আমার শরীরে জন্মগত ক্লোরোপ্লাস্টের ঘাটতি আছে। তাই আমি আপনার চোখে একটু কম সবুজ।" ব্যাপারটা স্পেরিও কিছুটা বুঝতে পারলো। কিন্তু সবকিছু যেন ওর কাছে স্বপ্নের মতো লাগছে। সে জিজ্ঞেস করলো, "আপনারা কি ধরনের কাজকর্ম করেন? মানে পেশা কি?"

প্রশ্নটা শুনে এরিনিন কিছুটা বিরক্ত হলো। ভালোরকম গাধার খপ্পরে পড়া গেল তো! ব্যাটার চিন্তাভাবনার শক্তিও নাই নাকি! সে পাল্টা প্রশ্ন করলো, "আপনি কাজ করেন কেন বলুন তো?" স্পেরিও বললো,"কাজ না করলে টাকা উপার্জন করতে পারবো না, তাই..." এরিনিন এবার বললো,"এই টাকা দিয়ে খাবার খাবেন। তাই তো? মানে খেয়ে বাঁচার জন্যই তো কাজ করেন? তাহলে আমরা তো সূর্যের আলো থেকেই খাবার পাচ্ছি। আমাদের কাজ করতে হবে কেন? শুধু আলো হলেই হলো।" স্পেরিও প্রতিবাদ করে উঠলো,"দেখুন, শুধু খাওয়াই আমাদের জীবনের লক্ষ্য না। আমরা জ্ঞান আহরণ করি। আমরা সমাজ গঠন করি, পরিবার তৈরী করি।" এরিনিন জবাব দিলো, "জ্বি, কিন্তু এগুলো করেন খাবার চাহিদা পূরণের পরেই। যেখানে আমাদের দিনভর খাদ্যের পেছনে ছুটতে হয়, সেখানে অন্য কিছু করার সুযোগ কোথায়? আর জ্ঞানের কথা বলছেন তো? আপনাদের জ্ঞানের পরিসীমা জানা আছে।"

স্পেরিও বুঝতে পারলো আসলে আলোর পেছনে ছোটা ছাড়া এদের কোনো কাজ নেই। এমন সময় হঠাৎ করে আকাশে সূর্যের আলো ফুটতে শুরু করলো। টিলার নিচে এসময় কিছু অবয়ব চোখে পড়লো। এরা এরিনিনের মতোই দেখতে! কিন্তু এদের গায়ের রং এরিনিনের চেয়ে কিছুটা গাঢ় সবুজ। সবাই কুঁজো হয়ে হাঁটছে। কাঁধ ঝুলে পড়েছে সবার, দুই পাশে দুটি হাত দড়ির মতো ঝুলছে। এদের কোনটি ছেলে আর কোনটি মেয়ে বোঝার কোনো উপায় স্পেরিও পেলো না।

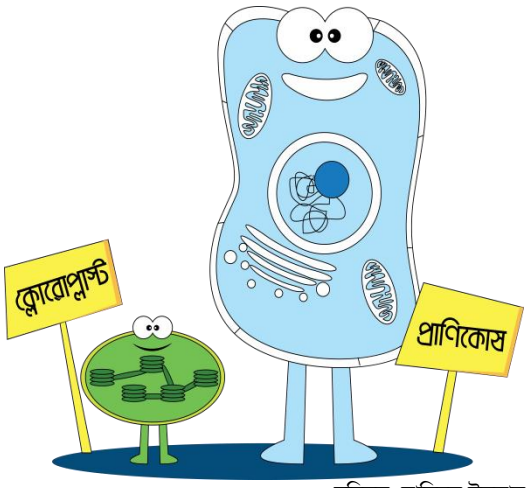

ছবিসূত্র: হাসিবুল ইসলাম

এরিনিনকে আবার স্পেরিও জিজ্ঞেস করলো, "সবাই এমন মন প্রাণ দিয়ে একটি কাজেই লিপ্ত! কোনো বৈচিত্র্য নেই।" এরিনিন জবাব দিলো, "আপনাদের দুনিয়াতেও প্রায় প্রতিটি জীবের উদ্দেশ্য হলো বেঁচে থাকা আর বংশ বিস্তার করা। আমাদের এগুলোর চিন্তা নেই। তাই কোনো বৈচিত্র্যও নেই।" বংশবিস্তারের কথায় স্পেরিওর মনে এদের জন্ম দানের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন জাগলো। এরিনিন জবাবে বললো, "পাঁচ বছর পর পর পুরুষদের সারা দেহে গোঁটা গোঁটা স্পোর তৈরী হয়। এগুলো বাতাসে ভাসতে ভাসতে নারীদের পেটের মাঝ বরাবর তৈরী হওয়া একটি কোণের মতো ফুলে গিয়ে পড়ে। তখন ফুল ঝরে গিয়ে সেখানে একটি বস্তার

মতো তৈরী হয়। এটার ভেতরে সন্তান বড় হতে থাকে। আর নারীটি এই বস্তা পিঠে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। একপর্যায়ে বাচ্চাটি বস্তা ফেঁটে বেরিয়ে আসে।"

এরিনিনের বর্ননা শুনে স্পেরিও জমে গেল। এরা নগ্নবীজী উদ্ভিদের মতো স্পোরের মাধ্যমে প্রজনন ঘটায়! এরা মানুষের মতো বাচ্চাকে পেটের মধ্যে ধরে না! বরং নাভীর সাথে সংযুক্ত একটি বস্তায় করে পিঠের ওপর নিয়ে ঘুরে বেড়ায়! কি ভয়ংকর! স্পেরিও জিজ্ঞেস করলো, "আপনারা কি সারাদিন সূর্যের সাথে তাল মিলিয়ে ছুটতে পারেন? তাহলে তো আপনাদের এক দিনে পুরো গ্রহটি ঘুরে আসতে হয়!" এরিনিন জবাব দিলো, "আপনাদের শরীরে আপনারা খাদ্য জমা রাখতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেহে এই সঞ্চিত খাবারের পরিমাণ অনেক কম। তাই যখন কেউ সূর্যের সাথে তাল মিলাতে না পারে, তখন গুটিসুটি মেরে এক স্থানে পড়ে থাকে পরদিনের সূর্যোদয়ের অপেক্ষায়। এই সময়ে সবাই জমা করা খাদ্য ব্যবহার করতে থাকে।"

স্পেরিও এরিনিনকে বললো, "সবাই ভাবলেশহীন হলেও আপনাকে জ্ঞানী মনে হচ্ছে। এমনটা কেন?" এরিনিন মনে মনে স্পেরিওকে কয়েকবার গালি দিলো। তারপর বললো, "অন্যদের খাবারের চিন্তা করতে হয় না। তাই তাদের অনুভূতিও নাই। আমার আলাদা খাবার দরকার, তাই আমাকে চিন্তা করতে হয়। আর এখানের প্রত্যেকেই আপনার তুলনায় কয়েকশ গুণ জ্ঞানী। শুধু অনুভূতিশূন্য!" স্পেরিও পুকুরটি দেখিয়ে বললো, "আপনার খাবার ওগুলো? এতে কি আছে?" এরিনিন বললো, "নারীরা সন্তান জন্ম দেয়ার পরে তাদের শরীর থেকে একপ্রকার সবুজ তরল বের হতে থাকে তিন চারদিন ধরে। এগুলো সেই তরল। এতে প্রচুর ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। এগুলো একবার খেলে আমার দেহে অনেকদিন ধরে ক্লোরোফিলের মাত্রা বেড়ে যায়। আমার মতোই আরো অনেকে বিভিন্ন জায়গায় এভাবে তরল সঞ্চয় করে।"

স্পেরিওর মাথা চক্কর দিয়ে বমি চলে আসতে লাগলো। কোনোমতে বমি আটকে নিচের দিকে চাইলো। এতক্ষণে সকাল হয়ে গেছে। আর চারদিকে এই অদ্ভুত প্রজাতির জীবে ছেয়ে গেছে। এরা সবাই আলো খাচ্ছে! এরা সালোকসংশ্লেষণকারী জীব! স্পেরিও এরিনিনকে বললো, "আপনারা কথা বলতে পারেন না? এভাবে এক মস্তিষ্ক থেকে আরেক মস্তিষ্কে যোগাযোগ করেন কেন?"

এরিনিন জবাব দিলো, "আমরা আপনাদের মতো শক্তি অপচয় করি না। আমাদের কাছে শক্তির মূল্য অনেক। তাই এভাবে তথ্য আদান প্রদানে শক্তি অনেক কম খরচ হয় বলে আপনাদের মতো কথা বলি না।" স্পেরিও ভাবলো এমন অদ্ভুত জায়গায় আর এক মুহূর্তও থাকা চলে না। সে এরিনিনকে বললো, "অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। এবার আমি আমার গ্রহে ফিরবো।" এরিনিন জবাব দিলো, "দয়া করে আপনাদের গ্রহটার যত্ন নিন। নিশ্চয়ই আপনি চান না আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের মতো হোক।"

স্পেরিও দ্রুত বললো, "না না, কখনোই চাই না।" এরিনিন বললো,"দুঃখের বিষয়, আপনি না চাইলেও এটিই আপনাদের ভবিষ্যৎ।"

স্পেরিও অবাক হয়ে বললো, "মানে!"

"মানে হলো, এটিই আপনাদের গ্রহ, সেই পৃথিবী। আর আমরাই আপনাদের ভবিষ্যৎ!"

হাসিবুল ইসলাম
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অনুষদ।

ছবিসূত্র: হাসিবুল ইসলাম

বাংলার ধাননামা

সবুজ এই বাংলার মাটিতেই লালিত হয়ে আসছে এর জীবন ও জীবিকা। এই মাটিই হয়েছে খাদ্যের যোগানদাতা, এমনকি এখানেই রোপিত হয়েছে এখানের অর্থনীতির চাকা। এই মাটি এবং এর শস্য নিয়ে আদি থেকে এখনো পর্যন্ত পর্বের শেষ নেই। আবার এই নিয়ে গবেষণাও থেমে নেই। আর এই গবেষণার প্রধান চরিত্রটি লুফে নিয়েছে বাংলার ধান। সময় যতো পেরিয়েছে, ধান এবং এর জিনগত বিবর্তন নিয়ে গবেষণাও হয়েছে বিস্তর। আজকের যে হাইব্রিড ধান, সে তো এসেছে মাত্রই। এর পূর্বেও বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে ধানের জিনে। সেই বিবর্তন ও পরিবর্তন নিয়েই এই ধাননামা। বাংলার ধানের বিবর্তন সম্পর্কে জানার পূর্বে আমাদের উপমহাদেশীয় ও পূর্ব এশীয় অঞ্চলের ধানের বিবর্তন সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নিতে হয়।

একসময় মনে করা হতো, একটি উৎস থেকেই সকল Domesticated ধানের বিবর্তন ঘটেছে। মূলত এই ধারণা বর্তমানে অগ্রহণযোগ্য বলেই মনে করছেন ধান গবেষকগণ। বরং গবেষণালব্ধ ফলাফল বলছে, বিভিন্ন প্রকারের প্রজাতি থেকে বিবর্তিত হয়েই এসেছে শেষপর্যন্ত এসেছে আজকের ধান। তবে সরাসরি ধান অর্থাৎ *Oryza sativa* নিয়ে আলোচনার পূর্বে ধানের প্রধান দুটি উপপ্রজাতি চিনে নেয়া যাক। এর একটি হলো ইন্ডিকা (*Oryza sativa Indica*) আর অপরটি জাপোনিকা (*Oryza sativa Japonica*)।

Civan et al.2015 ও Lando st al.2006 এর গবেষণা অনুসারে ইন্ডিকা উপপ্রজাতির ধানটির উদ্ভব হয়েছিলো ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে, তবে জাপোনিকার উদ্ভব হয়েছিলো চীনে। মজার ব্যাপার হলো ধানের এই দুটি উপপ্রজাতির সাথেই গভীর সম্পর্ক বাংলার ধানের।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ২০১৯ সালে নরসিংদীর উয়ারী বটেশ্বরে দুই ধরনের ধানের সন্ধান লাভ করেন, যা প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার বছরের পুরনো। পরবর্তীতে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে জানা যায়, ধানের জাতদুটি হলো ইন্ডিকা আর জাপোনিকা। অর্থাৎ সেই আদি উপপ্রজতির আঁঠালো জাতের ধানের চাষ এই বাংলায় প্রায় তিন হাজার বছর পূর্ব থেকেই। ধান গবেষকগণ তাই এই দুই জাতের ধানকেই বাংলার উত্তরসূরী হিসেবে ধরে নেন। অন্যদিকে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন 'বাংলা' অঞ্চলে মূলত ডুবো পানিতে উৎপন্ন হওয়া লম্বা আকৃতির আউশ ও আমন ধানের চাষ হতো।

'বাাংলাদেশে ধান' গ্রন্থেও বাংলায় এসকল অঞ্চলে এধরনের জাতের আউশ ধান চাষের বয়সকাল ধরা হয়েছে কয়েক হাজার বছর। যদিও এ বয়সকাল ধরা হয় রাজ দরবারসমূহের নানা নথির ভিত্তিতে। এরমধ্যে ২৭০০ বছর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে মাটির পাত্র তৈরীর সময় ধানের তুষ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। অপরদিকে আরো একটি নথিতে মহাস্থানগড়ের ব্রাহ্মী লিপি অনুযায়ী ২০০০ বছর আগে মৌর্য শাসন আমলে সম্রাটের কোষাগারে চাল রাখার

কথা বলা আছে। আর রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ায় সেখান থেকে জনগণকে চাল দেয়ার জন্য সম্রাটের দপ্তর থেকে নির্দেশ দেয়ার কথা উল্লেখ আছে সেই নথিতে। তবে উভয়ক্ষেত্রেই এসকল ধানের জাতের বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক কোনো প্রমাণ নেই।

এদিকে ধান গবেষকদের মতে, বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইন্ডিকা উপ-জাতের ধানের খোঁজ মিললেও উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত জাপোনিকা ধানের চাষ বাংলায় ইতোপূর্বে হওয়ার কোনো উপাত্ত মেলেনি। তবে চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উদ্ভাবিত এই দুই ধরনের উপপ্রজাতিকেই গবেষকগণ সংকরায়ন বা হাইব্রিডাইজেশনের পথিকৃৎ হিসেবে ধারণা করছেন।

ছবিসূত্র: হাসিবুল ইসলাম

পৃথক কূলের ধান হওয়া সত্ত্বেও এই দুই উপজাতের মধ্যে মিশ্রণের ফলে বেশ কিছু হাইব্রিড জাতেরও উদ্ভব ঘটে। Kawakami et a;.2007 গবেষণায় বলা হয়, ইন্ডিকা ধান বুনো (Wild) ধান *Oryza nivara* এর উত্তরসূরী এবং জাপোনিকা ধান হলো বুনো ধান *Oryza rufupagon* এর উত্তরসূরি। তবে ধানের এই বিবর্তনবাদ এবং ইতিহাসের বিভিন্ন নথি পরিষ্কারভাবে বাংলায় চাষকৃত আউশের সাথে ইন্ডিকা অথবা জাপোনিকা উপজাতের সম্পর্ক প্রমাণ করতে পারেনি। সে হিসেবে আউশকে তৃতীয় উপজাত হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন অনেক গবেষক। তবে আউশ ধানের এই বিভ্রাটের সমাধান দিয়েছে Choi et al.2017 এর গবেষণা। এই গবেষণাটি বলছে, জাপোনিকা কেবলমাত্র প্রোটো-ইন্ডিকার সাথে ক্রসওভার ঘটায়নি, বরং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশের সময় জাপোনিকার সাথে প্রোটো-আউশেরও ক্রসওভার ঘটেছে। যার ফলস্বরূপ আউশ ধানের উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ জাপোনিকা ও প্রোটো-আউশের ক্রসওভারেই আউশ ধানের সৃষ্টি।

নিকটবর্তী ইতিহাসে আউশ ও আমন ছাড়া ১৯৬৭ সালে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI) থেকে বাংলাদেশে প্রথম উচ্চফলনশীল বা উফশী (IR 8) জাতের ধান মাঠপর্যায়ে চাষাবাদ শুরু হয়। খাটো আকৃতির উফশী ধানই পরবর্তীতে লোকমুখে ইরি ধান হিসেবে পরিচিতি পায়। আর এই আউশ, আমন এবং ইরি থেকেই বাংলাদেশ বর্তমানে ১০৬টি উচ্চ ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। তারমধ্যে ৯৯টি ইনব্রিড ও ৭টি হাইব্রিড। বাংলাদেশ বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় চার কোটি মেট্রিক টন ধান উৎপাদন করে থাকে যার ৯৩ শতাংশই আসে উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত থেকে।

জিনাত তামান্না
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অনুষদ।

Picture courtesy: Foysal Abedin

History of the Discovery of DNA

The Blueprint for Life

DNA is the code of life, that means by which every living organism on Earth stores its' genetic information. Although the discovery of DNA occurred in 1869 by Swiss-born biochemist Fredrich Miescher, it took more than 80 years for its importance to be fully realized. And even today, more than 150 years after it was first discovered, exciting research and technology continue to offer more insight and a better answer to the question: **Why is DNA important?**

Here goes a brief description of the history of DNA discovery.

1863

Gregor Johan Mendal, who was a monk, played a very important role in the discovery of Genes and Heredity. He is known as the father of Genetics.

1869

DNA was first isolated by the Swiss physician Friedrich Mischer, who discovered a microscopic substance in the pus of discarded bandages. As it is resided in the nuclei of cells, he called it Nuclein.

Picture courtesy: Hasibul Islam

Figure: Gregor Johann Mendel

1878

Albert Kossel isolated non-protein components of nuclein, Nucleic Acid and later isolated its five primary nucleobases.

1919

Phoebus Levene identified the base, sugar and phosphate nucleotide unit. He suggested that DNA is consisted of a string of nucleotide units linked together through the phosphate groups.

1928

Frederick Griffith was trying to find a vaccine against *Streptococcus pneumoniae* but instead made a breakthrough in the world of heredity. He did four experiments in which he injected strands of bacteria into mice.

Picture courtesy: Hasibul Islam

Figure: James Dewey Watson

1933

While studying virgin Sea-urchin eggs, Jean Brachet suggested that DNA is found in the cell nucleus and that RNA is present exclusively in the cytoplasm. At the time, "yeast nucleic acid" (RNA) was thought to occur only in plants, while "thymus nucleic acid" (DNA) only in animals. The latter was thought to be a tetramer, with the function of buffering cellular pH.

1937

William Astbury produced the first X- ray diffraction pattern that showed that DNA had a regular structure.

1943

The Avery-Macleod-McCarty experiment demonstrated that isolated DNA was the maternal at which genes and chromosomes are made.

1950

Erwin Chargaff discovered two rules that helped lead to discovery of the double helix structure of DNA strongly linking towards the base pair makeup.

Picture courtesy: Hasibul Islam

Figure: Francis Crick

1952

Maurice Wilkins and Rosalind Franklin were the first to obtain very good x-ray diffraction images of DNA fibres. At that time, little was known about the structure of DNA.

1953

James Watson and Francis Crick began to examine the DNA structure. Using previous x-ray diffraction photos of DNA fibres, they discovered that it showed an X shape, which is also characteristic of a helix.

1962

After Franklin's death Watson, Crick and Wilkins jointly received the Nobel Prize In physiology or medicine.

Discovery of DNA is a groundbreaking discovery. Every new discovery in our understanding of DNA leads to further advancement in the idea of precision medicine, a relatively new way doctors are approaching healthcare through the use of genetic and molecular information to guide their approach to medicine. The discovery of DNA has radically changed the way we breed and utilise crops and the means by which we recognise and protect our plant biodiversity.

Ayesha Tamanna
Sher-e-Bangla Agricultural University
Faculty of Agriculture.

ছবিসূত্র: হাসিবুল ইসলাম

ভয়ংকর অভিজ্ঞতা

আমি আক্কাস, গ্রামে থাকি। আমার অফিস বাড়ি থেকে একটু দূরে। একদিন রাতে অফিসে দেরি হয়ে যাওয়ায় বাড়ি ফিরতেও দেরি হলো। রাত দুটোর সময় বাড়ি ফিরছি। কবরস্থানের পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। সেখানে রয়েছে একটা বিশাল গাছ। দিনের বেলায় ভয় পেতাম না, কিন্তু রাতের বেলা বলে একটু ভয় লাগছিলো। দূর থেকে হঠাৎ দেখি গাছের মধ্যে আগুনের মতো কি যেন জ্বলছে। আগুনটা বেশ অদ্ভুত। মাথার ভেতরে কি সব কুচিন্তা আসতে লাগলো। ভাবলাম গাছটা কোনোভাবে পেরিয়ে যেতেই হবে। আর তো কোনো বিকল্প রাস্তা নেই। সৃষ্টিকর্তার নাম নিয়ে চলতে লাগলাম।

গাছটার কাছে যেতেই দেখলাম, ছোট একটা কি যেন গাছটিকে ভীষণভাবে দোলাচ্ছে। আরেকটু কাছে গিয়ে দেখি, ওমা, সেকি! একটি ভূত! ভূতের চোখদুটো আগুনের গোলার মতো জ্বলজ্বল করছে। গাছটাকে এমনভাবে দোলাচ্ছে যেন এখুনি ভেঙে পড়বে। কখনো এপাশ, তো কখনো ওপাশ। চোখ জ্বলজ্বল করা ভূতটি কখনো উপরে উঠছে, আবার কখনোবা নিচে নামছে। চোখ বন্ধ করে দৌড়ে এগোতে লাগলাম। মনে হচ্ছিলো ভূতটি যেন আমার পেছন পেছন আসছে। যাহোক, কোনোভাবে গাছটি পার হয়ে আসলাম। কোনো একটা গাছের নিচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নেই। সামনে একটা গাছ দেখতে পেয়ে তার নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। হঠাৎ করে দেখি আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে! মনে মনে ভাবলাম, নিশ্চয়ই এটা সেই ভূতের কাজ। সে-ই আমার গলা চাপ দিয়ে ধরেছে। আর এক মুহূর্তও গাছের নিচে না দাঁড়িয়ে দৌড়িয়ে এগোতে লাগলাম।

এমনভাবে দৌড় দিলাম যে পা পিছলিয়ে সোজা গিয়ে পুকুরে পড়ে গেলাম। পুকুর থেকে উঠতে গিয়ে যতবার চেষ্টা করছি, ততবারই মনে হচ্ছে ভূতটি যেন আমার পা টেনে ধরেছে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পা পুকুর থেকে উঠে আসলাম। পুকুর থেকে উঠেই এক দৌড়ে বাড়িতে ফিরলাম। রাস্তায় মনে হচ্ছিলো, দৌড়ানোর সময় কে যেন আমার পা ধরে রেখেছে।

বাড়ি ফিরে দেখি আমার পায়ে কিছু দড়ি আর পাতা আটকে আছে। আমার আর বোঝার বাকি রইলো না, কেন পানি থেকে আমার উঠতে কষ্ট হচ্ছিলো। পরদিন সকালে সেই ভূতুড়ে বিশাল গাছটির কাছে একটা মরা ইঁদুর পড়ে থাকতে দেখা গেলো। পুরো ব্যাপারটাই এখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আসলে যে জ্বলজ্বল চোখওয়ালা ভূতের কথা আমি চিন্তা করছিলাম, সেটা আর কিছুই না, একটি বিড়াল মাত্র! এই বিড়ালটিই গতরাতে ইঁদুরটিকে ধরার জন্য গাছে উঠছিলো আর নিচে নামছিলো। তাই গাছটি এপাশ ওপাশ দুলছিলো। আসলে বিজ্ঞানের হিসেবে মানুষ যে পরিমাণ আলোতে দেখে, বিড়াল তার ছয় ভাগ কম আলোতেও দেখতে পারে। এর কারণ তার চোখের রেটিনার পেছনে ‘টেপেটাম লুসিডাম’ নামক টিস্যু স্তর আছে, যা রেটিনা দিয়ে যে আলো যায় তাকে আবার রিফ্লেক্ট করতে পারে যেন ফটোরিসেপ্টরে তা ধরা পড়ে। তাই যখন বিড়ালের চোখে কোনো আলো পড়ে, তা বিবর্ধিত হয়ে প্রতিফলিত হয়। তাছাড়া বিড়ালের চোখের ‘পিউপিল’ (যে ছিদ্র দিয়ে চোখে আলো প্রবেশ করে) অনেক বড়, তাই অল্প আলোতে

কোনো জিনিস দেখার জন্য তারা চোখের পিউপিল যথেষ্ট বড় করতে পারে। এতে অতি মৃদু আলোও সে দেখতে পায়। এ কারণেই রাতে আলো পড়লে বিড়ালের চোখ চকচক করে।

আর যেই অদ্ভুত আগুন দেখেছিলাম, সেটি ছিলো জোনাকি পোকার আলো! জোনাকি পোকার দেহ থেকে আলো বিচ্ছুরণের মূল মাধ্যম হলো লুসিফেরিন (Luciferin) নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ। জোনাকি পোকার দেহে এই পদার্থটি উৎপন্ন হয়, যা বাতাসের অক্সিজেনের সাথে মিশে আলো তৈরী করে। এর জন্যই আমাদের মনে হয় জোনাকি পোকা আলো বিচ্ছুরণ করে।

ছবিসূত্র: হাসিবুল ইসলাম

আর রাতের বেলা গাছের নিচে গলা চাপ দিয়ে ধরার যে ব্যাপারটা সেটা হলো, গাছ রাতে অধিক হারে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। ফলে গাছের নিচে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব বেশি থাকে এবং অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। এতে করে গাছের নিচে থাকা ব্যক্তির শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। তাই রাতের বেলা গাছের নিচে, বিশেষ করে অধিক পাতাযুক্ত গাছের নিচে অবস্থান করা ঠিক না।

ঐদিন রাতে সত্যিই বড্ড ভয় পেয়েছিলাম। আসলে ঐদিনে ঘটনায় বুঝতে পেরেছিলাম, ভূত বলতে কিচ্ছু নেই। বলা যায়. এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা।

ফাওজিয়া গওহর
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অনুষদ।

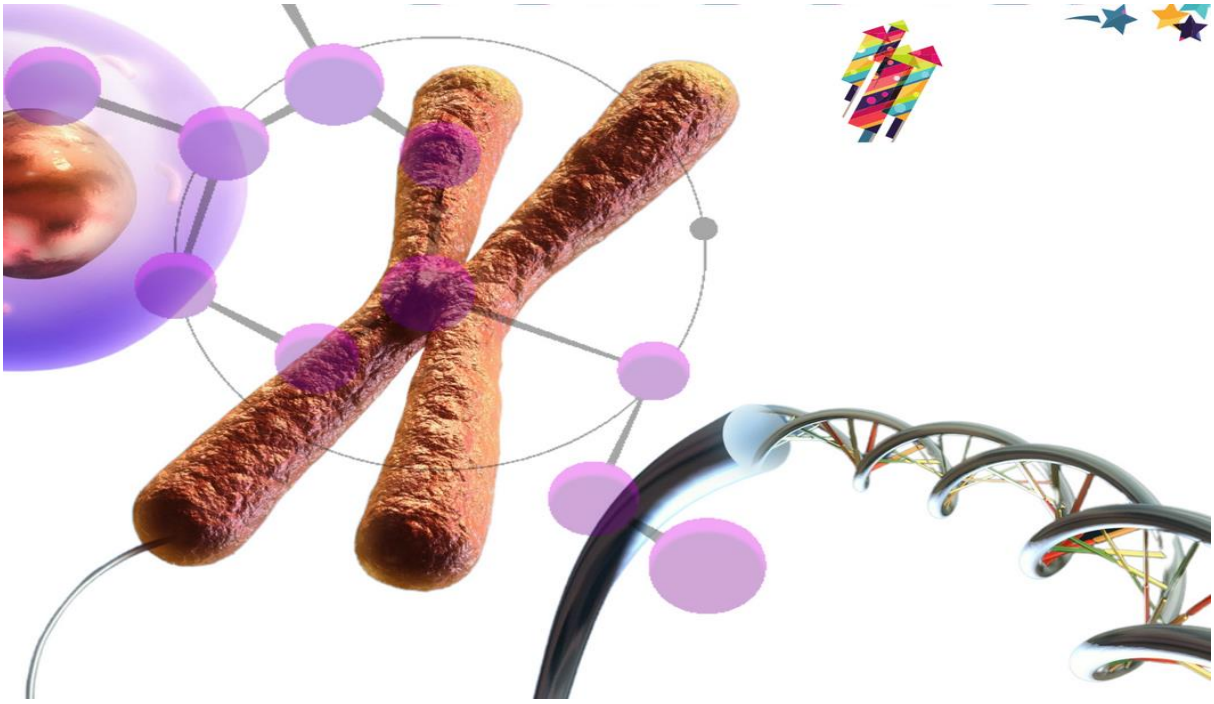

ছবিসূত্র: শারমিন আক্তার

“Is Our Fate indeed in Our Gene?”

জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিছু নতুন ধারণার মধ্যে অন্যতম হলো Gene Therapy. Gene Therapy যেমন নতুন একটি নতুন শাখার উন্মোচন, তেমনি হাজার বিস্ময় এবং প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেয় বর্তমান জগতকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, “What is this mystical new wonder called Gene Therapy?”

ধরুন, একজন ব্যক্তির টিউমার কোষগুলো দ্রুত বিভাজিত হয়ে মস্তিষ্কে ক্যান্সার সৃষ্টি করছে। এই কোষগুলো গঠনের মূল কারণ হলো কিছু ত্রুটিপূর্ণ রূপান্তরিত জিন। এক্ষেত্রে আমরা যদি একটি উপকারী ভাইরাস Target Cell (টিউমার বহনকারী সেল)-এ প্রবেশ করাই, তাহলে ভাইরাসটি অনেকগুলো কপি তৈরি করবে। যেসব কোষ এই ভাইরাস বহন করবে, তা টিউমার সেলকে আক্রমণ করবে এবং এসব কোষে জেনেটিক পরিবর্তন ঘটাবে। এই পরিবর্তন ঘটানোই মূলত Gene Therapy.

জিন থেরাপি, জিন ট্রান্সফার থেরাপি নামেও পরিচিত। এটি মূলত জেনেটিক রোগের কারণ ঘটায় এমন কোনো মিউটেশনের মেরামত করার জন্য ব্যক্তির জিনোমে একটি সাধারণ জিনের সূচনা। কোনো সাধারণ জিনকে একটি মিউট্যান্ট কোষের নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করানো হলে জিনটি ত্রুটিপূর্ণ অ্যালিল থেকে পৃথক হয়ে ক্রোমোজোমাল সাইটে একীভূত হয়, যা ত্রুটিপূর্ণ জিন মেরামত করতে সক্ষম। অর্থাৎ সাধারণ জিন অন্য কোনো কার্যকরী জিনে প্রতিস্থাপন ঘটাতে পারে যা এর বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনে। যদি সাধারণ জিন মিউট্যান্ট অ্যালিলকে পরিবর্তন করে, তখন রূপান্তরিত কোষগুলো প্রসারিত হয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে সাধারণ জিন তৈরী করবে। যা ত্রুটিপূর্ণ ফেনোটাইপ পুনরুদ্ধারে সক্ষম।

মানবদেহে জিন থেরাপি, cystic fibrosis, aedenosine deamine deficiency, hypercholesteromia, cancer এবং মারাত্মক Several Combined Immunodeficiency Syndrome (SCID) এর মতো রোগের ক্ষেত্রে সোমাটিক (দেহ) কোষে চেষ্টা করা হয়েছে। জিন থেরাপির মাধ্যমে সেরে ওঠা সোমাটিক কোষগুলো চিকিৎসারত ব্যক্তির ক্ষেত্রে লক্ষণ পরিবর্তন করতে পারলেও তা বংশানুক্রমে পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হবে না। এছাড়া Germline (Cell of ovary and testis) নামক জিন থেরাপির মূল লক্ষ্যই হলো germline এর মধ্যকার ত্রুটি সংশোধন করা। এটি সম্ভব হলেই তা মায়োসিসের মাধ্যমে নতুন germline তৈরি করবে এবং পরবর্তী প্রজন্মে পরিবর্তন আনবে। তবে Germline Gene Therapy বিভিন্ন প্রাণিতে পরীক্ষামূলকভাবে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হলেও মানুষের ক্ষেত্রে তা এখনো অনিশ্চিত।

এছাড়া বিজ্ঞানীরা Stemcell Therapy এর সাথে Gene Therapy-র সংমিশ্রণও পর্যবেক্ষণ করেছেন। তারা প্রাথমিক অবস্থায় Alpha-1 antitrypsin এর ঘাটতিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তির ত্বক থেকে কোষ সংগ্রহ করে সেগুলোর স্টেম কোষগুলোর পুনর্গঠন করেন। এটি পরবর্তীতে পরিণত লিভার কোষে স্বাভাবিকভাবে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলো।

ছবিসূত্র: হাসিবুল ইসলাম

পরীক্ষামূলক জিন থেরাপির জন্য 'ভেক্টর' নামক একটি জিন সরবরাহ করে তা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করতে হয়। ভেক্টর জিন মূলত কোষে সহজে সংক্রমণ করার পাশাপাশি নতুন জিন সরবরাহ করতে পারে। সেক্ষেত্রে ভেক্টর হিসেবে রেট্রোভাইরাস জেনেটিক উপাদানগুলো মানবকোষের ক্রোমোজোমে ইন্টিগ্রেট করতে পারে। তবে Adenovirus DNA কোষের নিউক্লিয়াসে অনুপ্রবেশ করতে পারলেও ইন্টিগ্রেট করতে পারে না।

উপরোক্ত পরিবর্তনগুলো বিবেচনা করলে আমরা মানতেই পারি যে, জিন থেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসায় যেমন বিবর্তন এসছে তেমনি এসেছে জিনোমে। James Watson বলেছিলেন, "We used to think that our fate is in our stars but we know that, in large measure, our fate is in our genes." অর্থাৎ Watson-এর ভাষ্যমতে ভাগ্য অনেকটাই আমাদের জিনের ওপর নির্ভরশীল।

তবে কিছু ক্ষেত্র যেমন, জেনেটিক ম্যানিপুলেশন, সিলেকশন, ভ্রুণের টিস্যু নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে Gene Therapy কিছু বিবাদের সম্মুখীন হয়েছে। অনেকেই মনে করেন, "Human should not 'Play God' and interfere in the natural order." অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করা অনেকের কাছেই অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। আবার অনেকের মতে Genetic Engineering যেখানে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত সেখানে এটি স্রষ্টার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়াও অনাকাঙ্ক্ষিত জীবাণু বংশানুক্রমে বাহিত হওয়ার সম্ভাবনায় অনেকেই এটিকে ন্যায়সঙ্গত মনে করছেন না।

১৯৯৯ সালে আমেরিকান কিশোরী Jasse Gelsinger জিন থেরাপির পরীক্ষায় মারা যান। আবার ফ্রান্সের ২০০০ গবেষক ঘোষণা করেছিলেন যে, X-Linked SCID (XSCID, an inherited disorder that effects males) দ্বারা আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার জন্য জিন থেরাপি সফলভাবে গৃহীত হয়েছে। অনেকের বিশ্বাস, এটি Eugenics এর প্রতিনিধি, যার লক্ষ্য ভবিষ্যত প্রজন্মকে পছন্দসই বৈশিষ্ট্য নির্বাচনের মাধ্যমে উন্নত করা!

তাই পরিশেষে অনেকেই অস্বীকার করতেও নারাজ যে, জিন থেরাপি অক্ষমতা এড়ানোর একটি উপযুক্ত প্রক্রিয়া যা একুশ শতাব্দীর প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠবে। ভবিষ্যতে হয়তো এই শব্দটি-ই পরিবারগুলোতে দৈনন্দিন ব্যবহৃত শব্দগুলোর একটি শব্দ হবে। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের জিন বিষয়ক আরো গবেষণা চিকিৎসা বিজ্ঞানে এনে দেবে এক বিশাল পরিবর্তন আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে দিবে এক বিশাল সম্ভাবনা। সুতরাং অবশেষে হয়তো বলাই যায় যে, ***"OUR FATE IS INDEED IN OUR GENE..."***

সুমাইয়া আজাদ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অনুষদ।

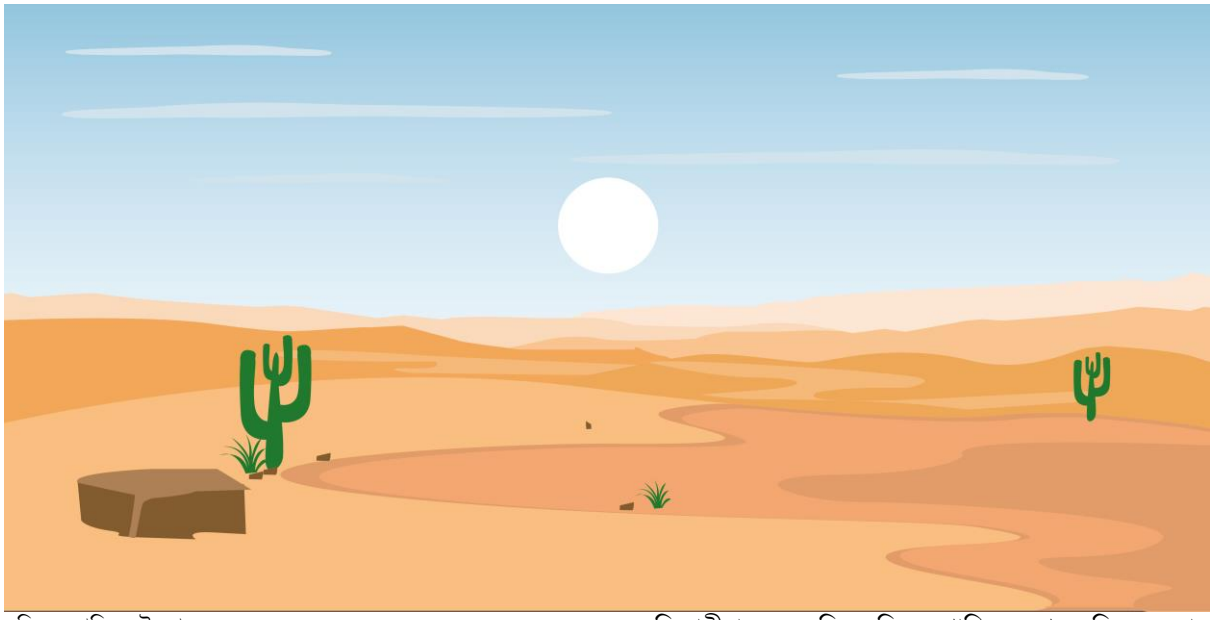

ছবিসূত্র: হাসিবুল ইসলাম

মরুভূমিতে পানির উৎস

মরুভূমি বলতে আমরা বুঝি অত্যন্ত শুষ্ক, বৃষ্টিবিরল এবং বালি দিয়ে আবৃত একটি অঞ্চল যা প্রাণির বসবাসের জন্য একদম অনুপযোগী। কিন্তু এই পরিবেশে প্রাণির বাস্তুতন্ত্র যে কত বৈচিত্র্যময়, তা কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি?

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া জীবের জীবন ধারণ অসম্ভব, তা কে না জানে! কিন্তু মরুভূমির এই বৈরী পরিবেশে প্রাণিরা পানি পায় কোথেকে? কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ, পাখি, স্তন্যপায়ী থেকে শুরু করে অনেক ধরনের অনেক প্রজাতির প্রাণির বিচরণ রয়েছে এখানে। এখানে যেমন তীক্ষ্ম দন্তবিশিষ্ট প্রাণি যেমন Rabbit, Kangaroo rat, Ground squirrels, Gophers, Mice ইত্যাদি বাস করে, তেমনি সবুজ ঘাস, গাছের মূল, বাল্ব, বিভিন্ন ধরনের ক্যাকটাস ইত্যাদিও জন্মায়। এসব প্রাণিগুলো কিন্তু একেবারে পানিশূন্য স্থানে থাকলেও নিজেরা পানি ছাড়া বাঁচে না। বাঁচার জন্য এরা বিভিন্ন উপায়ে ঠিকই পানি যোগাড় করে নেয়। একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়, মরুভূমির গাছগুলো বেশ পানি সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এই পানিই প্রাণিগুলোর জন্য একটি প্রধান পানির উৎস।

মরুভূমির প্রাণিরা গাছপালা থেকে পানি সংগ্রহ করলেও সবসময় কি মরুভূমিতে গাছপালা পাওয়া যায়? সত্যি বলতে মরুভূমি কোনো কিছুই জন্মানোর জন্য উপযুক্ত না, হোক সেটি প্রাণি বা হোক উদ্ভিদ। অতএব পানির অভাব এখানের প্রাণিদের একটি প্রধান সমস্যা। অভিযোজন ক্ষমতা এই সমস্যা থেকে প্রাণিদেরকে অনেকাংশেই মুক্তি দেয়। বিজ্ঞানীরা মরুভূমির কিছু প্রাণির ওপর কিছু মজার এক্সপেরিমেন্ট করেন। আর এই এক্সপেরিমেন্ট থেকে আমরা বেশ কিছু মজার তথ্যও জানতে পারি। চলুন কিছু এক্সপেরিমেন্ট দেখে নেয়া যাক।

Kangaroo rat (*Dimodomys sp.*) এর খাদ্যাভাস জানার পর বিজ্ঞানীরা এদের একটি বয়স্ক মা এবং তার তিনটি বাচ্চাকে Dry feed এবং Moist feed খেতে দেন। এদেরকে যে খাবারগুলো দেয়া হয়েছিলো। আর্দ্র খাবারগুলোর অনেকটা অংশ পানি থাকলেও শুকনো খাবারগুলো ছিলো একেবারেই শুষ্ক। এদেরকে পর্যাপ্ত খাবারের পাশাপাশি পানিও দেয়া হচ্ছিলো। কিন্তু দেখা গেল এরা আর্দ্র খাবার দিলে আর আলাদা করে পানি পান করছে না। আর আর্দ্র খাবার না দিলে তখনই শুধুমাত্র পানি পান করছে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন এসব প্রাণির পানির চাহিদা প্রাকৃতিকভাবেই অনেক কম।

এই জীবগুলোর প্রতিটি গড়ে ১৩.৩ গ্রাম খাবার খায় যার মধ্যে প্রায় ৭.৪ গ্রাম শুকনা খাবার থাক, আর বাদ বাকি ৫.৮ গ্রাম পানি। তার মানে এদের খাবারে প্রায় ৪৩.৬ শতাংশ পানি থাকে। কিন্তু আট দিন এসব প্রাণিগুলোকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এরা এদের খাবার থেকে মাত্র ৫% পানি শোষণ করেছে! মজার বিষয় হচ্ছে, এদের দেহে পানির পরিমাণ এতই অনেক কম ছিলো। কিন্তু তারপরেও এরা নিজেদের দেহের জন্য ৫% এর বেশি পানি শোষণ করেনি। এই অবস্থায়ও প্রাণিগুলো পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিলো। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পর্যাপ্ত পানিজাতীয় খাবার খেলেও এদের দেহে প্রাকৃতিকভাবেই পানির চাহিদা বেশ কম।

মরুভূমির প্রাণিরা দিনের বেলা প্রচণ্ড গরমে সাধারণত তাদের গর্ত ছেড়ে বের হয় না। তাদের পাকস্থলিতে তারা অনেকসময় খাদ্য জমা রাখতে পারে। দিনের বেলা যেই প্রচণ্ড গরমে মরুভূমি উত্তপ্ত থাকে, রাতে সেই মরুভূমিই বেশ ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে। ভৌগলিক কারণেই এমনটি হয়। আর এই ঠাণ্ডা হওয়াটা কিন্তু জীবের পানির চাহিদা পূরণেও কাজে দেয়। রাতের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় যখন মরুভূমির পাথরগুলোর ওপর শিশির জমে, অনেক প্রাণিই তখন তাদের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে এই পানি পান করে।

ছবিসূত্র: ইন্টারনেট

(চিত্র: *Moloch horridus*)

মরুভূমির Thorny Devil (*Moloch horridus*) এর দেহ কাঁটা দিয়ে আবৃত থাকে। মজার ব্যাপার হলো এই কাঁটা যেমন তাদের আত্মরক্ষায় সাহায্য করে, তেমনি পানি সংগ্রহেও সাহায্য করে। এদের দেহে কাঁটাগুলো দেহের আয়তন বৃদ্ধি করে দেয়। আর এদের ত্বকে অনেক ছিদ্র থাকে যার মাধ্যমে এরা রাতের শিশির সংগ্রহ করে দেহের ভেতরে জমা রাখতে পারে। রাতের বেলা শিশির কিংবা বৃষ্টির সময় পানি গায়ে পড়লে এই ছিদ্র দিয়ে এরা সহজেই গ্রহণ করে নিতে পারে। অবাক করা বিষয় হলো এই ছিদ্র দিয়ে তারা বাতাসের পানিও শোষণ করতে পারে।

মরুভূমিতে কোনো পরিশ্রম ছাড়া মাত্র ৪ গ্যালন পানি দিয়েই একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ১০ ঘন্টা চালিয়ে দিতে পারে। পরিশ্রম ছাড়া কিংবা শুষ্ক আবহাওয়ার সংস্পর্শে না এলে মানুষের তুলনামূলক কম পানির প্রয়োজন। কিন্তু মানুষের প্রতিদিনকার খাদ্য তালিকায় থাকা সবুজ শাকসবজি ও শস্যজাতীয় খাদ্য দেহে অনেকটাই পানি সরবরাহ করে। এমনিতেই শ্বসন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদনের সময় উপজাত হিসেবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর পানি উৎপন্ন হয়। এই পানি কিন্তু উদ্ভিদ নিজের কাজেই ব্যবহার করে। কিন্তু এরপরেও পানির অভাব দেখা দিলে দেহে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ভেঙে পানি ও শক্তি উৎপন্ন করে।

মরুভূমির মতো প্রচণ্ড বৈরী পরিবেশে প্রাণির বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে একমাত্র এখানের জীবদের দেহে পানি উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্যই না, পাশাপাশি তারা বালি কিংবা পাথর থেকেও পানি সংগ্রহ করতে পারে। আবার তাদের দেহে যেন পানির চাহিদা কম থাকে ও দেহের পানি যেন সূর্যের তাপে বাষ্পীভূত না হতে পারে এজন্য এখানের প্রাণিদের মধ্যে বেশিরভাগই হয়ে থাকে নিশাচর। প্রকৃতির এই বিশেষ অভিযোজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলোই ঊষর মরুকেও করে তুলেছে প্রাণের আবাসভূমি।

জান্নাতুল ফেরদাউস জিহান
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অনুষদ।

ছবিসূত্র: নাহিদ হাসান

WHAT I GOT FROM BDBO

বরাবরই আমার জীবনে বায়োলজির সাথে ছিলো ঘোর প্রেম, যেখানে অংক ছিলো চিরশত্রু, যার সাথে মন কষাকষি নতুন কিছু না। বায়োলজিকে ভালোবেসেই বাংলাদেশ বায়োলজি অলিম্পিয়াডের সাথে যুক্ত হওয়া। শুরুর গল্পটুকু হয়ে গেল; এবার আসা যাক সেই অংশে যেখানে বলছি এই বিডিবিও থেকে কি পেয়েছি!

বাংলাদেশ বায়োলজি অলিম্পিয়াড (ঢাকা নর্থ রিজিওন) নতুন শহর, মানুষের ভিড়ে নিজেকে মানিয়ে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করা এক কিশোরীকে দিলো আশ্রয়, একটু দম ফেলার জায়গা, আর কিছু নতুন মানুষ, কিছু নিখাঁদ মানুষ। আজ এবেলায় সেই মানুষদের স্মৃতিচারণ হোক, সাথে কৃতজ্ঞতা যাক বিডিবিওর ঝুলিতে।

বিডিবিওর সব কাজে; রোদে গরমে বৃষ্টির মাঝে ক্যাম্পেইনিং এর কাজে, এ বিল্ডিং থেকে ও বিল্ডিং ছোটাছুটিতে, প্রোগ্রামের আগে রাত জেগে ডেকোরেশনের কাজে, বিশাল জনগোষ্ঠীর সামনে মাইক হাতে, টিশার্টের সাইজ নিয়ে ঝগড়ায় সেই মানুষগুলো ছায়ার মতো থেকেছে পাশে। এই আবেগ, এই অনুরাগ এখন আর শুধু কাজের ক্ষেত্রেই নয়, অধিকারের সাথে বসে আছে আমার জীবন জুড়েও। তাদের সঙ্গ, তাদের উপস্থিতি আমার জীবনকে করেছে সহজ, আমি হয়ে উঠেছি হয়তো আরো আত্মবিশ্বাসী।

ভালোবাসি তাদের, ভালোবাসি বিডিবিওকে। ঠিক জানিনা কতটুকু এই সংগঠনকে আমি দিতে পেরেছি, তাও বারবার বলবো- ধন্যবাদ বিডিবিও, এরকম আস্থার জায়গা হয়ে থাকার জন্য।

নাবিয়া সুলতানা রিনি
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অনুষদ।

ছবিসূত্র: হাসিবুল ইসলাম

কল্পনারূপী বাস্তব

আচ্ছা, কেউ যদি আপনাকে বলে যে আপনি রাতের বেলা আপনার পছন্দের মানুষকে নিয়ে যা কল্পনা করেন তা বাস্তব (THINK POSITIVELY!) তাহলে আপনি কি বলবেন? আপনি কি বলবেন আমি জানি না, তবে আমার প্রতিক্রিয়া ছিল এরকম, "এই পাগলে বলে কি!" আমেরিকান এস্ট্রোবায়োলোজিস্ট ও প্ল্যানেটারি সায়েন্টিস্ট কার্ল স্যাগান (Carl Sagan) ঠিক এরকমের কিছুই বলেছেন। তিনি বলেছেন "Our thoughts, visions and fantasies have a physical reality. A thought is made of hundreds of electrochemical impulse." বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন যাকে 'SHOWMAN OF SCIENCE' তকমা দিয়েছে, চলুন তার উক্তি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

প্রথমে তার উক্তির তুলনামূলক সহজ দ্বিতীয় লাইনটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। এখানে তিনি বলেছেন যে আমাদের চিন্তা-ভাবনাগুলো শত শত তড়িৎ-রাসায়নিক সংকেত দ্বারা গঠিত। আসুন, এটা একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। আমাদের মস্তিষ্ক হচ্ছে আমাদের সকল চিন্তা-চেতনার উৎপত্তি কেন্দ্র। আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের শরীরের মোট ভরের মাত্র ২% দখল করলেও বিশ্রামরত অবস্থায় এটি শরীরের ২০% শক্তি ব্যয় করে। এক কথায় বলতে পারেন যে, "ছোট মরিচের ঝাল বেশি"। মানব মস্তিষ্ক প্রায় ১০০ বিলিয়ন স্নায়ু কোষ বা নিউরন(Neurons) দ্বারা গঠিত, আর এই নিউরনগুলো একে অপরের সাথে আবার ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন সংযোগ দ্বারা সংযুক্ত। এই সংযোগগুলোকে বলা হয় সিন্যাপস(Synapses)। প্রতিটি সিন্যাপস সংকেত প্রেরণ করতে ১ সেকেন্ডেরও কম সময় লাগে। কিছু কিছু সিন্যাপস সেকেন্ডে ১০০০টি পর্যন্ত সংকেত পাঠাতে পারে।

আপনার মস্তিষ্ক এই নিউরনগুলোর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেমন ধরুন আপনি এই লেখা পড়ার সময় আলোক কণিকাগুলো প্রতিফলিত হয়ে আপনার চোখের রেটিনার নির্দিষ্ট কোষে প্রবেশ করলে নির্দিষ্ট ইলেক্ট্রিক বা তড়িৎ সংকেত তৈরি করে। এখানে ইলেক্ট্রিসিটি বলতে আপনার বাসায় চলা ইলেক্ট্রিসিটি নয় বরং বিভিন্ন আয়নের(ions like k+, Na+ etc.) পরিবহন বুঝায়। এই সংকেতটি আপনার নিউরনের অ্যাক্সন নামক লম্বা অংশের শেষ প্রান্তে পৌঁছালে ঐখান থেকে সিন্যাপসে নিউরোট্রান্সমিটার(neurotransmitters) নামক রাসায়নিক নির্গত হয়। আগেই বলেছি সিন্যাপস হচ্ছে দুই নিউরনের সংযোগস্থল তাই নিউরোট্রান্সমিটারের কাজ হচ্ছে এই সংকেতকে এক নিউরন থেকে অন্য নিউরনে নিয়ে যাওয়া। যখন নিউরোট্রান্সমিটার অন্য নিউরনে পৌঁছে । এভাবে এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে সংকেতটি আপনার মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে যায় এবং আপনি তখন এই বিচিত্র আঁকাবুকিকে লেখা হিসেবে পড়তে পারেন। তাই ভবিষ্যতে কোন কিছু বুঝতে না পারলে আপনার মস্তিষ্ককে দোষ দিয়েন না, কারণ সে আপনার চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রমী।

এবার স্যাগানের উক্তির প্রথম অংশে আসা যাক। এই অংশে তিনি বলেছেন যে আমাদের চিন্তা, পরিকল্পনা, কল্পনার ভৌত উপস্থিতি বিদ্যমান। কিন্তু এক্ষেত্রে, বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানীরা দ্বিমত পোষণ করেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন আপনি প্রাণিদের প্রতি দয়ার নিদর্শন

স্বরূপ আর কোন মশা মারবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু যেই মাত্র একটা মশা আপনার শরীরে বসল আপনি তাকে থাপ্পড় দিয়ে মেরে ফেললেন। রক্ত খাওয়ারও সুযোগ দিলেন না। তাহলে একটু আগে যে মশা না মারার সিদ্ধান্ত নিলেন তার কি কোন ভৌত ভিত্তি ছিল? আমি-আপনি যাকে 'মন' বলি তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'Conciousness' বা 'চেতনা'। আমাদের চেতনা ভৌত জগতে প্রভাব ফেলে কিনা তা অনেক সময় কোয়ান্টাম মেকানিকসের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত হল " ডাবল-স্লিট পরীক্ষা" (double-slit experiment)। আপনি নিচে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি উক্ত পরীক্ষার যন্ত্রাংশ।

ছবিসূত্র: ইন্টারনেট

এখানে যদি আপনি একটি আলোর উৎস ও দেয়ালের মাঝে দুইটি সূক্ষ ফাঁক বিশিষ্ট পাত রাখেন তবে আলো-অন্ধকারের বিশেষ প্যাটার্ন দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু আলো এক ধরনের তরঙ্গ তাই এরকম এটা কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিকস না। এটা ২০০ বছর আগের একটি পরীক্ষা। কিন্তু আপনি যখন সূক্ষ্ম কণা (ইলেক্ট্রন, ফোটন,ইত্যাদি) নিয়ে পরীক্ষা করবেন তখন ব্যাপারটা কোয়ান্টাম মেকানিকসের। এবার যদি আপনি কোয়ান্টাম কণিকা গুলোকে ঐ সূক্ষ্ম ফাঁকা দিয়ে পাঠান তাহলে তারা ঠিক আলোর মত প্যাটার্ন তৈরি করে। কণার এই তরঙ্গের মত আচরণ বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তোলে। তাই বিজ্ঞানীরা এবার একটি ফাঁকার সাথে ডিটেক্টর লাগিয়ে দিলেন যাতে কণা যখন ঐ ফাঁক অতিক্রম করবে তখন বুঝা যায়। এবার দেখা গেল যে কণাগুলো আলোর মত প্যাটার্ন তৈরি করছে না। এবার যদি ডিটেক্টর চালু না রেখে শুধু সূক্ষ্ম ফাঁকার সাথে লাগিয়ে রাখা হয় এবং কণা পাঠানো হয় তবে আবার ঠিকই আলোর মত প্যাটার্ন দেখা যায়।

এখানে অনেকে বিজ্ঞানী কারণ হিসেবে আমাদের পর্যবেক্ষণকে দায়ী করেছেন। অর্থাৎ আমরা দেখেছি বলেই আলোর তরঙ্গের মত ধর্ম পরিবর্তিত হয়ে কণার মত ধর্ম প্রকাশ পেয়েছে। অনেকটা ধরুন, আপনি ভেবেছিলেন যে রোজা আসায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়ে যাবে তাই দ্রব্যের দাম বেড়ে গেছে। এটা আপনার কাছে যতই পাগলের প্রলাপের মত লাগুক না কেন ১৯২০ সালে বিজ্ঞানী বোর (Niels Bohr) ও তাঁর ছাত্র জর্ডান (Pascual Jordan) এই পরীক্ষাটি সম্পর্কে করে এই মতামত দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গও এই মতের সমর্থন জানিয়েছিলেন। ২০১২ সালে আমেরিকান গবেষক ডিন রেডিন ও তাঁর সঙ্গীরা এই পরীক্ষাটি আবার করেন এবং দেখান যে, মানুষের উপস্থিতিতে কণার তরঙ্গ ধর্মের বিচ্যুতি ঘটে। যদিও সমালোচকেরা এই পরীক্ষার অনেকগুলো ভুল তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে, কোয়ান্টাম পরিমাপের ভুল ধরার জন্য এখানে কোন ব্যবস্থা নেয়নি গবেষক দল।

এছাড়াও ১৯৮০ সালে বিজ্ঞানী রজার পেনরোজ (Roger Penrose) প্রস্তাব করলেন যে আমাদের মস্তিষ্কের রাসায়নিক পদার্থগুলো কোয়ান্টাম কণিকার মত আচারণ করে। তারা প্রয়োজন অনুসারে তরঙ্গ ও কণা ধর্মের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে নিউরনে সংকেত চলাচলে সহায়তা করে। কিন্তু ২০০০ সালে বিজ্ঞানী ম্যাক্স টেগমার্ক (Max Tegmark) এই ধারণা ভুল প্রমাণ করেন। তিনি হিসাব করে দেখান যে, কোন কণা কোয়ান্টাম অবস্থায় যতক্ষণ থাকে, তার থেকে অনেক বেশি সময় নিয়ে নিউরাল সংকেত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়।

২০১৫ সালে পদার্থবিদ ম্যাথিউ ফিশার (Matthew Fisher) মানসিক রোগের উপর লিথিয়াম (Li) আয়নযুক্ত ঔষুধের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করার সময় দেখতে পান যে লিথিয়াম আইসোটপের উপর ভিত্তি করে ঔষধের কার্যকারিতা পরিবর্তিত হয়। তিনি এই ব্যাপারে বলেন, যে কোয়ান্টাম মেকানিকস আমাদের মস্তিষ্কের সব অণুতে না কেবল ফসফরাস অণুতে দেখা যায় যা পরবর্তীতে অন্য বড় অণুর সাথে যুক্ত হয়ে নিউরনে প্রবেশ করে। যদিও তাঁর এই তত্ত্ব এখন প্রমাণিত হয়নি। আজকে আর না। আমরা আমাদের মন ও মস্তিষ্কে যে রহস্য আছে তা সমন্ধে এখনো পুরোপুরি জানি না। তাই আমাদের চিন্তা-ভাবনা বাস্তবে কোন অস্তিত্ব আছে কিনা তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যান। যদি আপনার স্বপ্ন হয় নোবেল পাওয়া, তাহলে সেটা বাস্তবও হয়ে যেতে পারে।

মোঃ রিয়াজ মাহাবুব
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যাল
কৃষি অনুষদ।

DNA DAY
2021

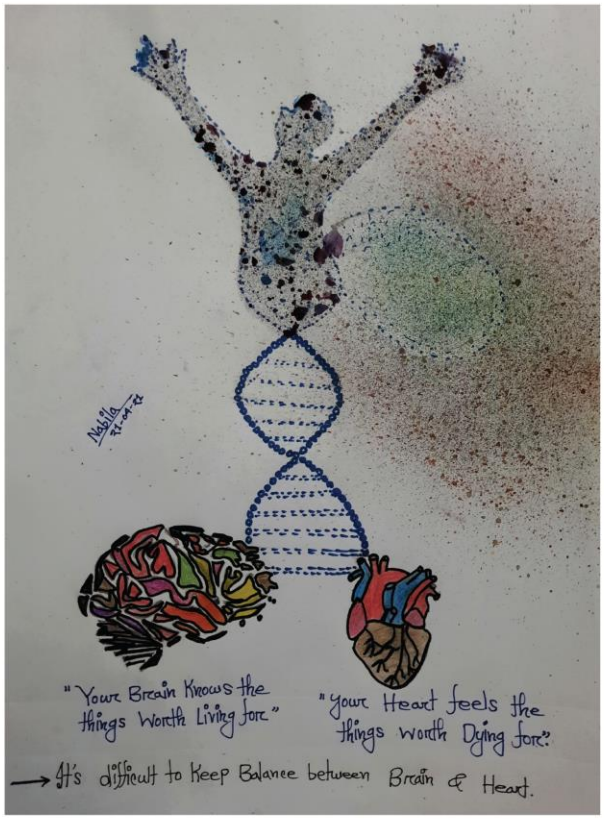

আতিয়া সানজিদা নাবিলা
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অর্থনীতি বিভাগ।

এলিচ মন্ডল
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
এনিম্যাল সায়েন্স এন্ড ভেটেরিনারি
মেডিসিন অনুষদ।

DNA DAY
2021

ফয়সাল আবেদিন
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অনুষদ।

শারমিন আক্তার
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অনুষদ।

ফাওজিয়া গওহর
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অনুষদ।

চিত্রকর

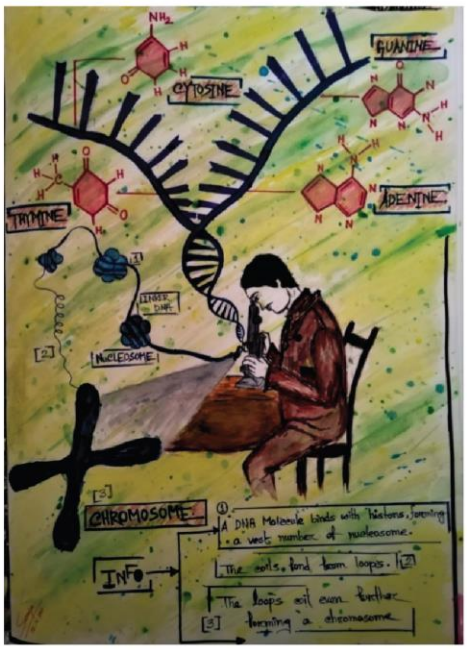

সুমাইয়া আজাদ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অনুষদ।

Volumes of history written in the ancient alphabet of G and C, A and T.
_Sy Montgomery.

ফাওজিয়া গওহর
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অনুষদ।

চলমান দীর্ঘদিনের করোনা পরিস্থিতি এবং লকডাউনে বাইরের খাবারের সাথে দেখাসাক্ষাৎ নেই অনেকদিন।
তাতে কি! ঘরে বসেই আঁকিবুকি করে ফেললাম কিছু থ্রিডি খাবার।

ছবিয়ালের দেয়ালি

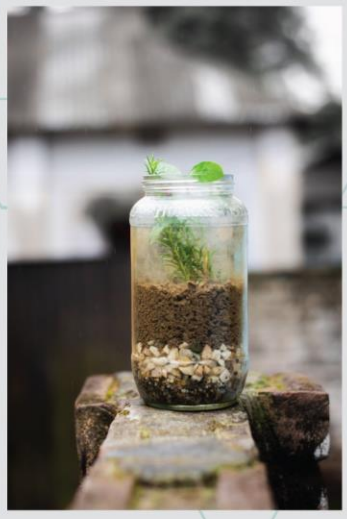

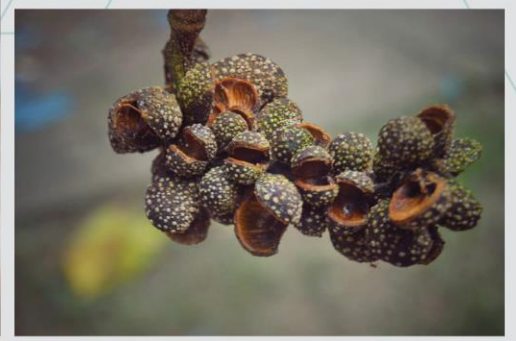

নাহিদ হাসান
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অনুষদ।

আফসানা হোসেন মীম
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অনুষদ।

ছবিয়ালের দেয়াল

মারুফ আহমেদ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অনুষদ।

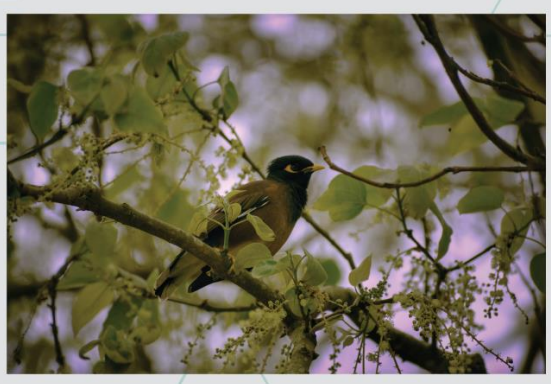

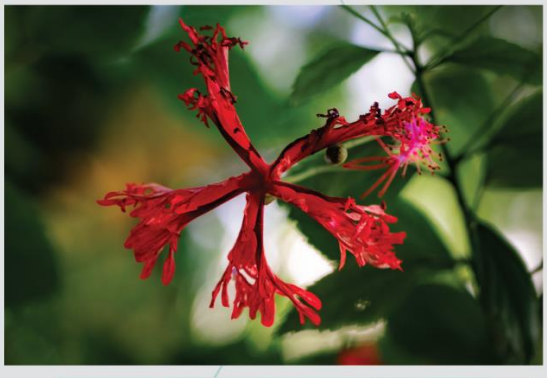

ছবিয়ালের দেয়াল

মারুফ আহমেদ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অনুষদ।

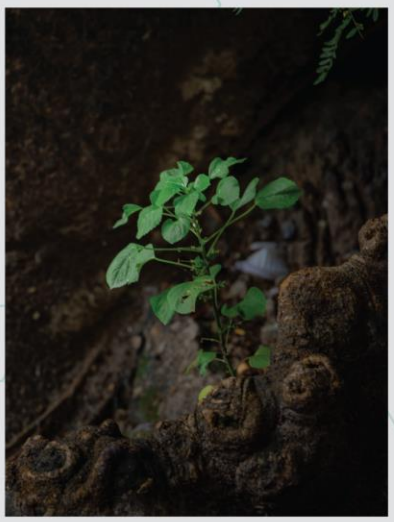

ছবিয়ালের দেয়াল

সৈয়দ সাজিদুল ইসলাম
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।

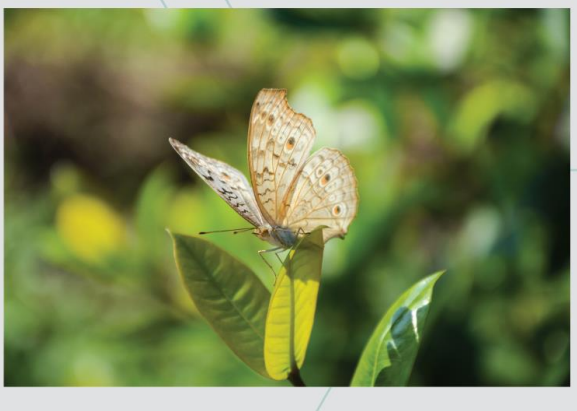

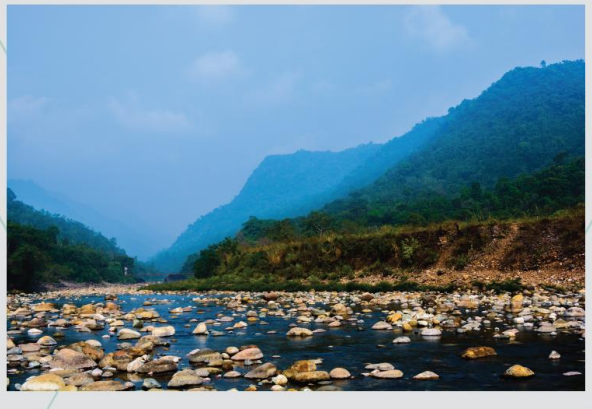

ছবিয়ালের দেয়াল

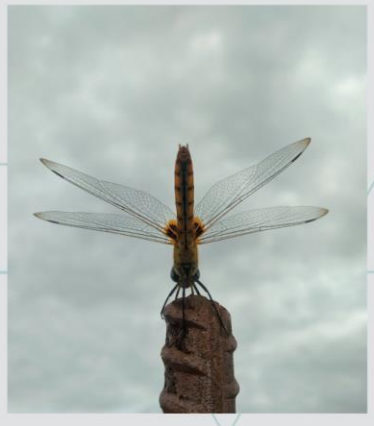

মশিউর রহমান মিতুল
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অনুষদ।

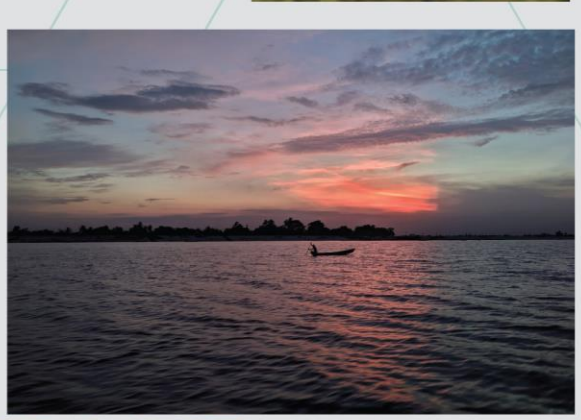

ফিরে দেখা স্মৃতির পাতা

RBO 2019

মারুফ খান
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কৃষি অর্থনীতি বিভাগ।

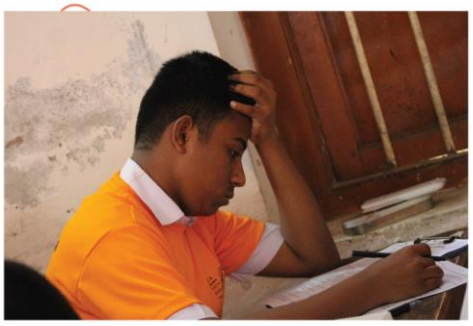

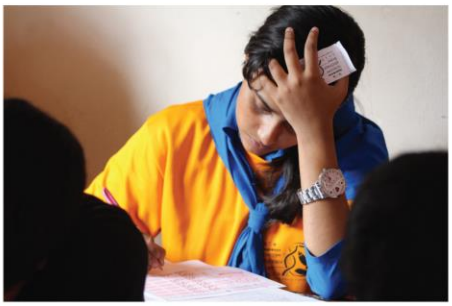

সমাপ্ত